গল্প

ছবি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবি

এক

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজারানী ছিল, পাত্রমিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; তখন পর্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনি বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্বে পেগুর ক্রোশ-পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকাকড়ি, মস্ত জমিদারি। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছে ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে-সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশি বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকেই তাঁহার যথাসর্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাধিল

না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এতবড় সুযোগই তিনি এ জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁহারও ও-পারের শমন আসিয়া পৌঁছিল এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ, বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইঁহার মৃত্যু-উৎসব শুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল এবং নীচে খেলাধূলা, নৃত্যগীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোনমতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছিয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

.

দুই

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুশী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকার-সূত্রে মা-শোয়েই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশী লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এতবড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর—সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিন দেশের রানী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁর অনেক রানী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁদের কারও আছে? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

.

তিন

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।

বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজসজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়দৌড়? যে জয়ী হইবে সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে!

কৈ তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই-নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী—হয়ত বা-থিন দুই-চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটি ছবির পানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক।

বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও—তুমি কাহারও কলঙ্ক নয়,—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি দু'চক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয়ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নরনারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন?

এই ছবিখানি পাঁচদিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

www.bengaliebook.com

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, আমাকে বিক্রি করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিবে কি?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুনি আছে সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তারপর?

তার পরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে–

তার পরে?

তারপরে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে–

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গেছে–শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ, সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাবো না।

যাবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তিভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই—আমি যাবো না!

ছিঃ—

তবে তুমিও চল!

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু, তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্যভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

একমুহূর্ত বা-থিনের কর্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষণ্ণমুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

www.bengaliebook.com

.

চার

প্রায় অপরাহ্নবেলায় মা-শোয়ের রূপা-বাঁধানো 'ময়ূরপঙ্খী' গোযান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোশাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়া ছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল, এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া কয়জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্তদেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদসিক্ত হস্তে তাহার শিরে জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়িতে স্থান দিল এবং সজলকণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর, কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়।

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্বল, কোমল ও সর্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর-আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহু লোক ভিড় করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

.

পাঁচ

সান্ধ্যভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

www.bengaliebook.com

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উলটা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে-সকল ছোট-খাটো কাজগুলি সে করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমনি অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গতরাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারে সম্ভ্রমের কথা—এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ-সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্যের আলোচনা শুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না। এবং আলাপ শেষ হইলে পো-থিন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে, তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন-কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাসি-তামাশা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্যগীতের সঙ্গে যখন খাওয়াদাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে-সকল যেন কত যুগের পুরানো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যানপ্রান্তের একটা নির্জন গৃহে এখন নির্বিঘ্নে আছে,—আজিকার এতবড় মাতামাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয়ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

.

ছয়

চিরদিনের অভ্যাস, প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা ‘এসো’ বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল; কিন্তু কাছে বসিয়াও আর একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকী কত?

অনেক।

তবে, এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই—আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার জামা-কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে, মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেমন নীচ তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনাদোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর থেকে আমি চিরকালের জন্য সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি

সংযত-স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানের জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে কোন কারণেই কাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালোবাসা একদিনেই যে এতবড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল ,আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা হলে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত-নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

.

সাত

শিশুকাল হইতে যে দুইজনের কখনও একমুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার নবীন উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেকদিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযতচিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া, অনেক ভাঙ্গা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইত, এতদিন শুদ্ধমাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন-কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া আছে—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি-উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত

হইতেছিল। বাটীর দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত, সেও মানুষ—সেও ঈর্ষার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয়ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্ত শয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক সে- সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল, কিছুই না—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গেছে—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি-উৎসবের বিরাট আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানাঘুষাও চলিতেছিল যে একদিন এই লোকটাই এ বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সেদিন বড় বেশি দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—চারিদিকেই আনন্দ-কলরব। শুধু যাহার জন্য এই-সব সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো চোখেই প্রায় পড়িল না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-একজন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে

থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে-লোক নাই, সে-মালা নাই; সে-আশীর্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা, কৈ তাহাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্য গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তাহার বাড়ি যাও—আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দু'জনকে আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি এক প্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা-গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাই হোক, তোমার অতিথি। একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গেছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও ত লোক আছেন, তাঁরা ত কথা বলিতে পারেন!

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গেছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল! নইলে তুমিও ত তাঁকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে!

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

.

আট

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-দুই পরে টের পাইল; আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে-লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূলকিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজ-দরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র-সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর তাহার বুঝিতে বাকী নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহার-ই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!

.

নয়

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

একজনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলিল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাহি না।

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ একমুহূর্তে উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল ; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না—একটা কড়ি পর্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেমনি করিয়া। আজই—এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত। সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তাহার পরে যেমন করিয়া খুশি, যত খুশি রক্ত শুষিবেন, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ, গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব হইবে

না, সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কতবড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

.

দশ

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র কিছু একটা করা চাই।

একদিন নাকি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময়ভিক্ষার নাম করিয়া আর

তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা-কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কিনা। গ্রামের মধ্যেই একজন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্বস্ব বিক্রি করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহমনের উপর অজ্ঞাতসারে কতবড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেইদিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটির সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রূর-হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কানাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল।

বা- থিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাতদিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে, প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত শুষ্ক-মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পেলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে। বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না।

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গোযান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল

হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, পেগুতে কে যাবে? গাড়ি কার? কোথায় এত টাকা পেলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুকনো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার–

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল–এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল–উঃ, এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাশে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু-কণ্ঠে কহিল, ব'সো। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে।

বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশীদিন থাকিও না। আর একটা কথা–

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে–

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও- সব আর একদিন শুনিব। টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো ?

টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে–নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে- ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার হাত ধরিল।

এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা একমুহূর্তেই একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে-মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান–কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব।

আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।